বিশেষ ক্রোড়পত্র

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম হয়েছে বলেই...

সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ঘোষণার পর দেশজুড়ে শুরু হয় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ৩০ লক্ষ শহিদের আত্মদান এবং ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। বিশ্বমানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের।

বাঙালি ও বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কালজয়ী নাম। বিশ্ববাঙালির গর্ব মৃত্যুঞ্জয়ী মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকৃত প্রবক্তা ও বাঙালি মানসে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির নির্মাতা। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম এবং সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালি জাতির জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাত্রিতে বিশ্বাসঘাতকদের নির্মম বুলেটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। পরবর্তীতে অবৈধভাবে ক্ষমতাদখলকারী বঙ্গবন্ধুর খুনি স্বৈরশাসক স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানি ভাবধারার বিকৃত ইতিহাস ও মূল্যবোধের বিস্তার ঘটানোর পাঁয়তারা চালায়।

খুনিরা ইতিহাসের পাতা থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নানা ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক-স্বৈরাচার তিন দশক ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে মিথ্যা ইতিহাস শেখাবার অপচেষ্টা চালায়। খুনিরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি।

সত্যি-ই শহিদের রক্ত বৃথা যায়নি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে অন্তর্ভুক্তির জন্য জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করেছে। যা সম্ভব হয়েছে কেবল তাঁরই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণে। আর এর ভিত্তি স্বাধীনতার পর জাতির পিতা-ই গড়ে দিয়ে যান।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন অর্থাৎ ১৭ মার্চ দেশে 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। তিনি শিশুদের প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তাই ওইদিনটিতে তিনি আনুষ্ঠানিক জন্মদিন পালন না করে শিশুদের নিয়ে আনন্দঘন সময় কাটাতেন। বাংলাদেশে শিশু উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট চারটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এক, শিশু কল্যাণের জন্য মায়েদের সম্পৃক্ত করে প্রতিষ্ঠা করেন মা ও শিশুকল্যাণ অধিদপ্তর। দুই, শিশুর সার্বিক উন্নতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় শিশু একাডেমি। উল্লেখ্য, এ দুটো প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত ভাবনা-পরিকল্পনা বঙ্গবন্ধুর সব সময়ই ছিল।

তিন, শিশুর শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৩-এ ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। বাংলাদেশের সে সময়ের সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্তটি ছিল সাহসী ও যুগান্তকারী। চার, ১৯৭৪-এর ২২ জুন শিশু আইন জারি করা হয়। এ আইন শিশু অধিকারের রক্ষাকবচ।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে আজ তাঁর ১০৪তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করতাম আমরা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাঁকে ধরে রাখতে পারিনি। এ প্রসঙ্গে স্নেহ ভালোবাসার একটা স্মৃতিচারণ করছি। ১৩ আগস্ট বিকাল তিনটার দিকে আমাকে ফোনে বললেন, "ঠিক পাঁচটার সময়ে গনভবনে দেখা করতে, সাথে তিনি এটাও বললেন, তোর পাঁচটা না ঘড়ির পাঁচটা। আমি গনভবনে গেলাম। উনার একান্ত সচিব সৈয়দ রেজাউল হায়াৎ সাহেবকে বললাম বঙ্গবন্ধু আমাকে আসতে বলেছেন, হায়াৎ সাহেব বললেন তিনি বিশ্রামে আছেন। তখন আমি বঙ্গবন্ধুর কথাটার অবতারনা করে বললাম, বঙ্গবন্ধু কিন্তু আমার পাঁচটা নয় ঘড়ির পাঁচটায় আসতে বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে উনি উপরে গেলেন এসে বললেন বঙ্গবন্ধু আপনাকে ডাকছেন। ওদিন বঙ্গবন্ধু অনেক সময় আমার সঙ্গে কথা বললেন। এক পর্যায় বললেন- দেখ মানুষকে তো বশ করতে পারলাম না, মাছকে কীভাবে বশ করছি সেটা তোকে দ্যাখাই। তখন আমি বললাম আপনি যদি মানুষকে বশ নাই করতে পারলেন তাহলে সাড়ে সাত কোটি মানুষ কিভাবে আপনার ডাকে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে দেশটাকে স্বাধীন করলো! প্রতিউত্তর তিনি করলেন না। এরপর হাটতে হাটতে লেকের কাছে নিয়ে গেলেন, পানিতে হাত দিলেন অমনি অনেক মাছ তার হাতে চলে এলো। ঠিক এই সময়ে সহকারী সচিব শাহরিয়ার ইকবাল এসে বললেন স্যার ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ এসেছেন দেখা করতে। যাই হোক আকস্মিক বঙ্গবন্ধু তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে আমার পিঠে তিনটা বারি দিয়ে উপস্থিত লোকদের বললেন পল্টুকে তিনটা বারি দিলাম, যাতে বঙ্গবন্ধুর কথা ওর মনে থাকে। আসলেই বঙ্গবন্ধুর হৃদয় ছিল যেমন বিশাল তেমনি শিশুর মতো সরল। তাঁর এই সারল্যকে কাজে লাগিয়েছে ঘাতকচক্র। যা আমাদের জন্য চরম দুর্ভাগ্যের।

'৭৫ এর ১৫ আগস্টের নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডের পর ব্রিটিশ এমপি জেমস ল্যামন্ড-এর খেদোক্তি ছিল, 'বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশই শুধু এতিম হয়নি, বিশ্ববাসী একজন মহান সন্তানকে হারিয়েছে।' বঙ্গবন্ধু আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার আদর্শ রয়ে গেছে। তিনি স্বাধীন দেশ দিয়ে গেছেন আমাদের। তাঁর আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এই আমাদের প্রত্যাশা। ১০৪তম জন্মদিনে পিতার প্রতি জানাই অতল শ্রদ্ধাঞ্জলি।

মার্চ মাস বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় মাস। এই মাসে অমোঘ বজ্রকণ্ঠে বাঙালি শুনেছে স্বাধীনতার ডাক। সেই ডাক দিয়েছিলেন যে পুরুষোত্তম ব্যক্তিটি সেই ক্ষণজন্মা অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এ অগ্নিগর্ভ মার্চে। যে মার্চের শুরুতেই পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র যে মার্চেই গণহত্যা সেই মার্চেই মুক্তিসংগ্রামের মহানায়কের কণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক এবং স্বাধীনতার ঘোষণা। ইতিহাসের কী অপূর্ব যোগসূত্র।

তাঁর হাত ধরেই বিশ্ব মানচিত্রে নতুন দেশ হিসেবে স্থান করে নেয় বাংলাদেশ। ২০২০ সালে তাঁর জন্মের শতবছর পূর্ণ হয়। এ বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছি, পাশাপাশি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীও উদ্‌যাপন করেছে জাতি।

২৫শে মার্চের রাতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে সাংবাদিক ডেভিড লোশাক দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় লিখেন 'অন্ধকার নেমে আসার কিছুক্ষণ পর, সরকারি মালিকানাধীন পাকিস্তান রেডিওর তরঙ্গের কাছাকাছি একটি তরঙ্গের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। শেখ মুজিবুর পূর্ব বাংলাকে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর বাণী নিশ্চয়ই ইতোপূর্বে রেকর্ড করা হয়েছিল এবং তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে তাই মনে হয়েছে। (তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্রঃ তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদকঃ হাসান হাফিজুর রহমান)

বঙ্গবন্ধু পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের নেতা, বিশ্বনেতা। গরিব-দুঃখী মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের দুঃখ দূর করার প্রতিজ্ঞা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতা তাঁকে রাজনীতিতে নিয়ে আসে। স্কুল থেকেই তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। গ্রামের স্কুলে তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। ১৯২৭ সালে শেখ মুজিব গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন।

১৯২৯ সালে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানেই ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৪১ সালে অসুস্থ শরীর নিয়েই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন।

ছাত্রজীবনেই মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করেন তিনি। আর এভাবেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে যান রাজনীতিতে।

রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর পিতা তাঁকে বাঁধা দেননি। যা নিজেই লিখেছেন তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে। বাবা শেখ লুৎফর রহমানের কথা উল্লেখ করে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'বাবা রাজনীতি কর আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছ এতো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না। আর একটা কথা মনে রেখ, 'sincerity of purpose and honesty of purpose' থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না। একথা কোনোদিন আমি ভুলি নাই।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা-২১)

ম্যাট্রিক পাসের পর কিশোর মুজিব ভর্তি হন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। সেখানকার ছাত্র থাকা অবস্থায় তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বড়ো পরিবর্তনগুলো শুরু হয়। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় হন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিমের মতো নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। অপরদিকে আবুল হাশিম ছিলেন মুসলিম লীগের সেক্রেটারি। শেখ মুজিবুর রহমান তখনই মুসলিম লীগের কাউন্সিলর।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৬৬ এর ঐতিহাসিক ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা। এ প্রসঙ্গে একটা কথা না বলেই পারছি না। আমরা যখন একাকি আলোচনার সুযোগ পেতাম তখন তিনি ছয় দফা সম্পর্কে বলতেন দ্যাখ 'আমি কি চাই- আমার বাঙালী সেনা/নৌ/বিমান বাহিনী প্রধান হবে, পুলিশের আইজি হবে, সচিব হবে, মুখ্য সচিব হবে, বড় বড় শিল্প কল-কারখানার, ব্যাংক-বীমার মালিক হবে'। তার মানে বঙ্গবন্ধুর কথায় ফুটে উঠতো তিনি কতোটা ধ্যানে স্বপ্নে বাঙালিত্বকে হৃদয়ে ধারণ করতেন।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এরপর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান বঙ্গবন্ধু। সেখান থেকে ইংল্যান্ড যান। এরপর সেখান থেকে দিল্লি হয়ে স্বদেশের মাটিতে তিনি পা রাখেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি। স্বাধীনতার স্থপতিকে বরণ করতে সেদিন লোকারণ্য ছিল ঢাকার পথ-ঘাট। পিতাকে কাছে পেয়ে বর্ণনাতীত কষ্টের মাঝেও নতুন করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে সব হারানো বাঙালি জাতি। বিজয়ের উল্লাসে আনন্দাশ্রু ঝরেছিল। তাই তো দেশে ফিরেই রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) তাঁর ভাষণে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটি গড়ে তুলতে সবার সহযোগিতা চান বঙ্গবন্ধু। জানান তাঁর পরিকল্পনার কথা। পাশাপাশি তাঁর ডাকে মানুষ যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেজন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান তিনি।

বঙ্গবন্ধু বলেন, "বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র। বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে, বাংলাদেশকে কেউ দমাতে পারবে না। বাংলাদেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে লাভ নাই। আমি যাবার আগে বলেছিলাম ও বাঙালি এবার তোমাদের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। আমি বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমরা ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলে সংগ্রাম করছো। আমি আমার সহকর্মীদের মোবারকবাদ জানাই। আমার বহু ভাই বহু কর্মী আমার বহু মা-বোন আজ দুনিয়ায় নাই তাদের আমি দেখবো না।"

তিনি বলেন, "আমি আজ বাংলার মানুষকে দেখলাম, বাংলার মাটিকে দেখলাম, বাংলা'র আকাশকে দেখলাম বাংলার আবহাওয়াকে অনুভব করলাম। বাংলাকে আমি সালাম জানাই আমার সোনার বাংলা তোমায় আমি বড়ো ভালোবাসি বোধহয় তার জন্যই আমায় ডেকে নিয়ে এসেছে।"

স্বাধীনতার পর অল্প সময় পেয়েছিলেন জাতির পিতা। তিনি ঠিক শূন্য থেকে শুরু করেছিলেন। সম্পদ বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। ছিল শুধু জনগণ। জনগণের আস্থা। আর তা নিয়েই শুরু করেছিলেন পথচলা। আর সেই জনগণকেই দেশ গড়ার কাজে নেমে পড়ার আহ্বান জানালেন তিনি। বললেন, 'আজ থেকে আমার অনুরোধ, আজ থেকে আমার আদেশ, আজ থেকে আমার হুকুম ভাই হিসেবে, নেতা হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, প্রেসিডেন্ট হিসেবে নয়। আমি তোমাদের ভাই, তোমরা আমার ভাই। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের যুবক যারা আছে তারা চাকরি না পায়। মুক্তিবাহিনী, ছাত্র সমাজ তোমাদের মোবারকবাদ জানাই তোমরা গেরিলা হয়েছো তোমরা রক্ত দিয়েছো, রক্ত বৃথা যাবে না, রক্ত বৃথা যায় নাই।'

সত্যি-ই শহিদের রক্ত বৃথা যায়নি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে অন্তর্ভুক্তির জন্য জাতিসংঘের চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করেছে। যা সম্ভব হয়েছে কেবল তাঁরই কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের কারণে। আর এর ভিত্তি স্বাধীনতার পর জাতির পিতা-ই গড়ে দিয়ে যান। ❑

লেখক : সদস্য-উপদেষ্টা পরিষদ এবং চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া উপ-কমিটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ও সভাপতি বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ (বিসিপি)

সতেরোই মার্চ পিতার শুভ জন্মদিন

আসলাম সানী

হে নতুন- শুভ আগামীর
সাড়ে তিনহাজার বছরের
গৌরবান্বিত বাঙালি বীর-

এখানে দাঁড়াও-
ভালোবাসায় বুকটা বাড়াও,
এসো এই সবুজে- শ্যামলে
এদিকে তাকাও
স্বস্নেহে ফিরে চাও।

এই বত্রিশ নং ধানমন্ডির
মহাকালের স্মৃতিময়-
এই বাড়িটির
দুয়ারে ধীর- স্থির
দু'দন্ড বসে যাও
যদি তুমি দূরগামী যাত্রী হও
-আগামীর।

পাবে তুমি সৌন্দর্য অপার
দখিনা সরোবরে সৌন্দর্য শাপলার-

না-না কেবল শোক নয়
দ্রোহে- শক্তিতে- ভক্তিতে জয়
-হোক, তোমারই চির নির্ভয় ,

হে সুন্দর- স্বপ্নময়- কিশোর-
তোমাকে ডাকছে-
স্মৃতিভাস্বর
জাতিপিতা- বঙ্গবন্ধু মুজিবর।

এসো বন্ধু- এসো ভাই
হে প্রদীপ্ত যুবক
ডিজিটলি বিশ্বে আগাই
লিখে- পড়ে দেশকে সাজাই
পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা
স্মার্ট বাংলাদেশ খুঁজে পাই।

আনন্দ হাসি গানে
এই স্মৃতিসৌধ- শহীদ মিনার
থাক বাঙালির প্রতিপ্রাণে-

এই বারো আউলিয়া-
শ্রী চৈতন্য- অতীশ দীপঙ্কর-
এই পূণ্য ভূমি- এই মৃত্যুউপত্যকা
- থাক চির ভাস্বর,
পদ্মা- মেঘনা- যমুনা- মধুমতি
তেরোশত নদী-ঝরনা-পাহাড়
- বঙ্গোপসাগর-

এই গোপালগঞ্জ- টুঙ্গিপাড়ায়
যেখানে পৃথিবীর স্বপ্ন- সাহস
শ্রদ্ধা এসে দাড়াঁয়-
দোয়েল- শালিক- ঘুঘুরা হারায়
এই মুগ্ধ প্রবহমানতায়
মেঘেরা- বৃষ্টিরা
ছুটে আসে ইশারায়।

এসো দেখো-
পলাশ- শিমুল- কৃষ্ণচূড়ার লালে
গদ্য লেখো,

এসো বঙ্গমাতার মুখ
কামাল- জামাল- রাসেলের বুক-
যাদের মহান ত্যাগে আত্মদানে
এই বাঙালি আর বাংলাদেশের সুখ-
একাত্ম হও অনুভবে-

ইতিহাস- গৌরবে
হবে হবে তোমারই জয় হবে।

তুমি পাবে ঠাকুর মা'র ঝুলি
শুনবে বুড়ো অ্যাংলা ক্ষিরের পুতুল
পথের পাচাঁলীর অপু- দূর্গার বুলি,

আপন মনে তুমি ছুটে যাবে-
হে তুরুন-ময়মনসিংহ গীতিকা
মহুয়া- মলুয়া- আলালের ঘরের দুলাল
সুয়োরানী দুয়োরানীর ভাবে।

খনা- চন্দ্রাবতী- আলাওল
লালন- হাছন- রবি- নজরুল
জীবনানন্দে- সুকান্তে পাবে মূল।

জাতির পিতার স্বপ্ন স্বাধীন-
-সার্বভৌম পাঠ
এই অবন ঠাকুর- দক্ষিণারঞ্জন
-লালী মজুমদার
জসীমউদদীর নকশি কাথাঁর মাঠ
উদার সোজন বাদিয়ার ঘাট-

উন্নয়ন- উৎপাদনে
শস্য- ফসল- ধানে ধানে
তুমি এগোবে
সৌরভে গৌববে
বাহান্ন একাত্তরের বিজয় উৎসবে

হে নতুন হে স্বাপ্নিক আগামীর
হে প্রজন্ম শ্রেষ্ঠ বাঙালির
সতেরই মার্চ পিতার শুভ জন্মদিন
হোক চির অমলিন,

আজ জাতীয় শিশু দিবস-
শিশুরা হাসবে- খেলবে- গাইবে
অস্তিত্বের নৌকা বাইবে
ভবিষৎ খুঁজে পাইবে
হে- কিশোর- তরুণ- যুবা
তুমিও আগাইবে...।

বাংলাদেশের অপর নাম শেখ মুজিবুর রহমান

প্রতিবাদ করে বলেন, 'কোনো নেতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন, তার প্রতিবাদ করা এবং তাঁকে বুঝিয়ে বলার অধিকার জনগণের আছে। বাংলা ভাষা ৫৬ শতাংশ লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি।'

শেখ মুজিবের বাবা চাইতেন তাঁর ছেলে আইন পড়ুক। কিন্তু যুবক শেখ মুজিবের তাতে তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। বাবা তাঁকে এমনও বলেছিলেন, আইন পড়ার জন্য তিনি বিলেতেও যেতে পারেন। তাঁর ইচ্ছা ছেলে ব্যারিস্টার হবে। প্রয়োজনে তিনি জায়গা-জমি বিক্রি করতেও প্রস্তুত ছিলেন। শেখ মুজিব বাবাকে জানালেন, বিলেতে যাওয়ার চেয়ে মুসলিম লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রতিবাদ করাটা তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আক্ষেপ করতেন, যে পাকিস্তানের জন্য তিনি অন্যদের সঙ্গে আন্দোলন করেছেন আর যেই পাকিস্তান পেয়েছেন দুটির মধ্যে অনেক তফাৎ। তাঁকে গ্রামের সাধারণ মানুষ যখন প্রশ্ন করতেন যে পাকিস্তানে তারা নির্যাতন আর অবিচারের স্বীকার হন, সেই পাকিস্তানের জন্য তিনি কেন আন্দোলন করেছিলেন, তখন তিনি বেশ বিচলিত হতেন। তিনি এও বুঝেছিলেন, কোনো মুসলিম লীগ নেতা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হোক তা চাইতেন না। তিনি আরও দেখলেন কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়ন হচ্ছে এবং পূর্ব বাংলা অবহেলিত হচ্ছে। শেখ মুজিব সবসময় এটি উপলব্ধি করতেন কোনো আন্দোলন প্রতিবাদ করতে হলে প্রয়োজন একটি দক্ষ ও কার্যকর সংগঠন, যে কারণে তিনি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে ছাত্রলীগ খুবই ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকায় ফিরে ছাত্রলীগকে আবার পুনর্গঠন করার দায়িত্ব নিলেন। ঢাকায় ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন হলো শেখ মুজিবের সভাপতিত্বে নতুন কমিটি হলো। সেই কাউন্সিলে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন, 'আজ থেকে আমি আর আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সভ্য (এর আগে তিনি ছাত্রলীগের একজন সদস্য মাত্র ছিলেন) থাকব না। ছাত্রপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকার আর আমার কোনো অধিকার নাই। আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। কারণ আমি ছাত্র নই।' এমন কথা এখন ভাবা যায়?

ছাত্ররাজনীতি থেকে অব্যাহতি নিয়ে শেখ মুজিব একটি রাজনৈতিক দল গঠনের দিকে নজর দেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তরুণ শেখ মুজিবসহ অনেক ছাত্রনেতাই জড়িত ছিলেন। এতে টাঙ্গাইলের ছাত্রনেতা শামসুল হক বেশ সহায়তা করেন। একটি খসড়া ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করা হয়। তাতে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। শুধু দেশ রক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রাখার প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তী সময় এই প্রস্তাবগুলোই ঐতিহাসিক ছয় দফার ভিত্তি রচনা করে। বলে রাখা ভালো আওয়ামী লীগ গঠন করার সময় শেখ মুজিব জেলে ছিলেন । জেল-জুলুমের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার সবসময় শেখ মুজিবের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনকালে বঙ্গবন্ধু ১৮বার জেলে গেছেন, প্রায় ১৩ বছর জেলে কাটিয়েছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন দুইবার (১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও ১৯৭১ সালের পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র মামলা)।

কাজের মানুষ শেখ মুজিব বুঝতে পারতেন কোন সময় কী কাজটা করতে হবে। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, জনগণকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক করতে হলে তাদের সামনে শাসকদের কীর্তিকলাপ তুলে ধরার কোনো বিকল্প নেই। তিনি সোহরাওয়ার্দীসহ আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের নিয়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন এলাকায় সভা-সমাবেশের মাধ্যমে মানুষের কাছে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-শাসনের কথা তুলে ধরতেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা ছিল নিরঙ্কুশ।

১৯৫৩ সাল নাগাদ দেশে একমাত্র রাজনৈতিক দল যা জনগণের দলে পরিণত হতে পেরেছিল, তা হচ্ছে আওয়ামী লীগ। এর অন্যতম কারণ ছিল, দলের সভাপতি মওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জনগণের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। আর দলে শেখ মুজিব, শামসুল হক, মোল্লা জালালউদ্দিন, নইমউদ্দিন আহমেদ, খালেক নেওয়াজ খানের মতো একঝাঁক তরুণ নেতার সমাবেশ হয়েছিল। মওলানা ভাসানী আসামের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি প্রশ্নে গণভোটের সময় তাঁর ভূমিকার জন্য পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে একটি পরিচিত ও জনপ্রিয় নাম হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন সামনে রেখে একটি যুক্তফ্রন্ট হয়েছিল, যেখানে আওয়ামী লীগ ছাড়াও ছিল কৃষক প্রজা পার্টি, নেজামে ইসলামী আর গণতন্ত্রী দল। নেতৃত্বে ছিলেন মওলানা ভাসানী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল। সেই নির্বাচনই ছিল ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এক পাকিস্তানের প্রথম ও সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন। তবে নির্বাচন শেষে যুক্তফ্রন্ট এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যে সরকার গঠন করেছিল তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। এরপর শুরু হলো নতুন মাত্রায় পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের একটি সিভিল সরকারকে উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসনপর্ব শুরু হয়। সব রাজনৈতিক নেতাকে জেলে যেতে হয় আর নিষিদ্ধ হয় সব রাজনৈতিক দল ও তাদের কর্মকাণ্ড। সেনাশাসনে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আওয়ামী লীগ। কিন্তু দলটির তৃণমূল কর্মীরা শত বাধা-বিপত্তির মধ্যেও দলটিকে টিকিয়ে রাখেন।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব কর্তৃক ঘোষিত বাঙালির মুক্তির সনদ ছয় দফায় আইয়ুব খান পাকিস্তান ভাঙার একটি নীল নকশা আবিষ্কার করেন এবং কিছুদিন পরই শেখ মুজিবকে আটক করা হয়। তিনিসহ ৩৫ জন আওয়ামী লীগ নেতা, সামরিক-বেসামরিক আমলার বিরুদ্ধে একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত) রুজু করা হয়। সেই

মামলার শেষ পরিণতি ছিল মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু সারা দেশে আইয়ুব বিরোধী তুমুল ছাত্র আন্দোলনের (উনসত্তরের গণ-আন্দোলন) তোড়ে আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু হিসেবে বাংলার রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। ততদিনে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি, আর তাজউদ্দীন আহমেদ সাধারণ সম্পাদক।

আইয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান রচনা করবেন। মওলানা ভাসানীসহ অন্য বামপন্থী দলগুলো এই সেনাশাসকের অধীনে ওই নির্বাচনে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন, এই নির্বাচনই বদলে দিতে পারে পাকিস্তানের ইতিহাস আর উপমহাদেশের মানচিত্র। পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয় ১৬৭টি আসনে।

বাঙালি পাকিস্তান শাসন করছে, তাতো পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মানতে পারে না। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ অধিবেশন নির্ধারিত ছিল। ১ তারিখ ইয়াহিয়া খান এক রেডিও ঘোষণার মাধ্যমে তা স্থগিত করে জিন্নাহর পাকিস্তানের কফিনে শেষ পেরেকটি ঠোকেন। সারা বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে পূর্ব বাংলার সিভিল প্রশাসনের ভার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হাতে চলে গিয়েছিল। ইয়াহিয়া খানের সংসদ অধিবেশন স্থগিতাদেশ ঘোষণার পর সারা বাংলা এক উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ে। ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্সের পড়ন্ত বেলায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমি জনগণের অধিকার চাই'। শেষ করেন এই বলে, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

৯ মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ পাকিস্তানি সৈন্যদের দখলমুক্ত হয়ে এক স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন। স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু বেঁচে ছিলেন মাত্র সাড়ে তিন বছর। এই সাড়ে তিন বছরে তাঁর কীর্তি বাংলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁকে করেছে অমর। তবে যে বিষয়টির ওপর তাঁর সার্বক্ষণিক দৃষ্টি ছিল সেটি হচ্ছে প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করা। তিনি কখনো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেননি। প্রয়োজনে তিনি দলের সংসদ সদস্যদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চেয়ে দলকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। দলের সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে দলকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন কামারুজ্জামানের ওপর। বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু একজনই জন্মেছিলেন। আমরা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছি। তবে জন্ম জন্মান্তর ধরে যারা বাংলাদেশকে বিশ্বাস করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ধারণ করে, তাদের মাঝেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বেঁচে থাকবেন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন এমন একজন নেতা যিনি যে কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে ছুঁতে পারতেন ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের ৩০ লাখ শহিদের রক্তে বিধৌত এই বাংলাদেশের যেকোনো স্থান যে কোনো সময়। জন্মদিনে তাঁকে আবারো বিনম্র শ্রদ্ধা। ❑

লেখক: সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।